গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ

নম্বরঃ২০.০০.০০০০.৩০৯.২৯.০৮৪.১৯(পার্ট-১)- ৪৬

০৪ মাঘ, ১৪২৮বঙ্গাব্দ
তারিখঃ----------
১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ "Bangabandhu's Journey Towards Hunger and Poverty free Planned Economy" শীর্ষক সেমিনারের র‍্যাপোর্টিয়ারের প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক গত ২৪-১১-২০২১ তারিখ "Bangabandhu's Journey Towards Hunger and Poverty free Planned Economy" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের র‍্যাপোর্টিয়ারের প্রতিবেদন এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

এমতাবস্থায়, উক্ত সেমিনারের র‍্যাপোর্টিয়ারের প্রতিবেদনটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

১৮/০১/২০২২

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৫

১। উপসচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ (এপিএ টার্গেট পূরণের নিমিত্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি সেল, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, গবেষণা কর্মকর্তা, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। জনাব হারাধন চন্দ্র সরকার, সহকারী সচিব, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (পরিকল্পনা বিভাগের এপিএ শাখায় প্রেরণের অনুরোধসহ)।

নম্বরঃ২০.০০.০০০০.৩০৯.২৯.০৮৪.১৯(পার্ট-১)- ৪৬

০৪ মাঘ, ১৪২৮বঙ্গাব্দ
তারিখঃ----------
১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। উপসচিব, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সচিব মহোদয়ের দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ।

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

"Bangabandhu's journey towards hunger and poverty free planned economy"
শীর্ষক সেমিনারের প্রতিবেদন

প্রধান অতিথি : জনাব এম. এ. মান্নান এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বিশেষ অতিথি : ড. শামসুল আলম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সভাপতি : জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক: ড. আতিউর রহমান, সভাপতি, উন্নয়ন সমন্বয়ক, অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

২৪ নভেম্বর ২০২১

স্থান : এনইসি সম্মেলন কক্ষ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

র‍্যাপোটিয়ার :

১. রাহ্‌নুমা নাহিদ, উপপ্রধান
২. ফরিদা সুলতানা, উপসচিব

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত Bangababandhu's Journey Towards Hunger and Poverty Free Planned Economy শীর্ষক সেমিনার ২৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখ বুধবার দুপুর ২:০০ ঘটিকায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম.এ. মান্নান এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ড. শামসুল আলম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আতিউর রহমান, অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক। প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. বিনায়ক সেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

২. স্বাগত বক্তব্যঃ

জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অতিরিক্ত সচিব তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। শুরুতে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদ এবং মুক্তিযুদ্ধে নিহত ৩০ লাখ শহীদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান জানান। তিনি বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী যৌথভাবে উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এই সেমিনারে বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী এবং অকুতোভয় নেতৃত্বের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত ভঙ্গুর একটি অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি তিনি তাঁর প্রজ্ঞা ও সুচিন্তিত পুনর্গঠন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করা, খাদ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৭১ এর পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার ফলে বঙ্গবন্ধু আমাদের কাছ থেকে শারীরিকভাবে দূরে সরে গেলেও আজও আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়েই পথ চলছি। বঙ্গবন্ধুর সে আদর্শকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেখানো ২০২১ সালের ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, এটি বাস্তব। বঙ্গবন্ধুর প্রণীত পরিকল্পিত পথনকশা অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ, ২০৭১ এবং ২১০০ সালের স্বপ্নের বাংলাদেশ অর্জন সম্ভব হবে।

৩. প্রধান অতিথির বক্তব্যঃ

জনাব এম. এ. মান্নান এমপি,মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা, চেতনা, ধারণা আমাদের কাজে প্রতিফলিত করার কথা বলেন। শুধু জন্মশতবার্ষিকীতে নয় জাতির পিতাকে আমরা প্রতিনিয়ত স্মরণ করে যাচ্ছি বলে তিনি উল্লেখ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আজকের এ সেমিনারের আয়োজন। তিনি বলেন বিদগ্ধ পন্ডিতবর্গের উপস্থাপনা ও আলোচনার মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করবো। বাংলাদেশকে উন্নত, বিজ্ঞানসম্মত রাষ্ট্রে পরিণত করার যে বিশাল স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখতেন, সেমিনারের আলোচনা হতে প্রাপ্ত পথনির্দেশনা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অত:পর বঙ্গবন্ধুর ধারণা আমাদের প্রতিদিনকার কাজের সাথে মিশেল করে বাংলাদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে পারবো বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

৪. বিশেষ অতিথির বক্তব্যঃ

ড. শামসুল আলম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে উল্লেখ করেন যে, আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। গত এক দশকে এদেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের যখন পঞ্চাশ বছর হবে তখন এদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে, ২০১৪/২০১৫ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে, ২০১৫ তে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে, যা আগে কখনো ধারণা করা যায়নি-এ সকল বিষয়ই

২০১০ সালে প্রণীত ২০১০-২০২১ সালের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় উল্লেখ ছিল। এরপর ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি জোড় দেয়া হয়েছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের উপর। ২০২০ সালে সরকার রূপকল্প ২০২১ এর ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা "রূপকল্প বাস্তবে রূপায়নঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১" গ্রহণ করেছে। রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩০ এর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান, উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উত্তরণ, এবং ২০৪১ এর মধ্যে দারিদ্র্যের দ্রুত অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়া। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হিসাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) গ্রহণ করে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জন করে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে সফল হবে। এ পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক ও সেক্টরাল কৌশল নির্ধারণে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনায় দুটি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, যা হলো- ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি। 'কাউকে পেছনে ফেলে নয় (Leaving No One Behind)', সকলকে সাথে নিয়ে উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সূচকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলকে চিহ্নিত করে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামাজিক বিমা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়ন একদিনে সম্ভব হয়নি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চিন্তা চেতনাকে আরও জনমুখী করে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই উন্নয়নের ধারাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

৫. মূল উপস্থাপনা

ড. আতিউর রহমান, সভাপতি, উন্নয়ন সমন্বয়ক, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবি শামসুর রহমানের 'ধন্য সেই পুরুষ', কারণ 'নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সব সময় ছিলো বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির কেন্দ্রে'- উপস্থাপনার শুরুতে অবহিত করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান। ভরসার বাতিঘর হয়ে চরম দুর্যোগেও হতাশ না হয়েও দূরদর্শী নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু আশার বাণী ছড়িয়েছেন। অনেক দিন ধরে ঔপনিবেশিক অপশাসনের কবলে পড়া বিকাশরুদ্ধ বাঙালি জাতির মধ্যে আশা করবার অধিকার জাগিয়ে তুলতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান সফল হয়েছিলেন। তাই কয়েক দশক ধরে অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭১-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঙালির নিজের রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

২০২১ সালে এসে আমরা একই সঙ্গে উদ্‌যাপন করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এটিই উপযুক্ত সময় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশকে প্রকৃত অর্থেই 'সোনার বাংলা' করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও কর্মের ধারাবাহিকতাগুলো নতুন ভাবে স্মরণ করার। এর ফলে বঙ্গবন্ধুর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে প্রতিনিয়ত চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন পথনকশা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুকে জানার সাথে সাথে দেশকে জানবে যা তাদের মনোজগতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখবে। তরুণ প্রজন্মসহ সকলেরই জানা দরকার যে, বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির কেন্দ্রীয় জায়গায় গোড়া থেকেই ছিলো বাংলার নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই যখন তিনি দেখেছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানি অপশাসকরা ঔপনিবেশিক কালের মতোই বাংলার মানুষকে শুধু শোষণই করেছেন, তখনই তিনি নতুন করে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মতে ভাষা আন্দোলনে একই সাথে ভাষার দাবি এবং জীবন মরণের লড়াই ছিল। ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা তাঁর মতো স্পষ্ট করে আর কেউ এতো আগে বলেননি।

ছয় দফা: বাঙালির আকাঙ্ক্ষার বাস্তবমুখি প্রতিফলন

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি এসে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য রাজনীতির কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় করে তোলেন বঙ্গবন্ধু। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৬৬ সালে তিনি বাংলার জনগণের কাছে ছয় দফা পেশ করেন। গণসংযোগের মাধ্যমে মুক্তির ছয়টি দাবী তিনি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। উল্লখ্যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থকেই চলছিলো পূর্ব বাংলার উপর অপশাসন আর শোষণের রাষ্ট্রীয় নীতি। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি নিজেদের সুবিধার্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে পক্ষপাতদুষ্টমূলকভাবে পূর্ব বাংলাকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করতে থাকে যার ফলে উভয় অঞ্চলের মধ্যকার আর্থিক বৈষম্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে। সে সময়কার বিশিষ্ট অর্থনীতবিদ অধ্যাপক নুরুল ইসলামের বরাতে উল্লেখ করা হয় যে ১৯৫১-১৯৬০

সময়কালে সরকারের উন্নয়ন ব্যয় পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ৩.৫ থেকে ৫ গুণ বেশি ছিল। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে সরকারি ও বেসরকারি কোন খাতের বিনিয়োগেই পূর্ব বাংলার অংশ ৩৬% এর বেশি ছিল না। দুই অঞ্চলের আয় ব্যবধান ১৯৪৯-৫০ এ ৩২% থেকে ১৯৬৯-৭০ এ দাঁড়ায় ৬১%। এমন পরিস্থিতিতে সম্পদের অসম বন্টন ও ব্যবহারের ফলে পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে সম্পদ পাচার হচ্ছিল ব্যাপক হারে। রপ্তানি আয়ের উদ্বৃত্তের প্রধান অংশই সে সময়ে ব্যয় হচ্ছিল পশ্চিমে। আর পূর্বের ঘাড়ে চাপছিল ঋণের বোঝা।

ছয় দফায় বঙ্গবন্ধুর যে অর্থনৈতিক চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছিল তা ছিল খুবই সুচিন্তিত। নিজের গণসংশ্লিষ্টতা থেকে উদ্ভুত অভিজ্ঞতা এবং পূর্ব বাংলার বাস্তব পরিস্থিতির আলোকেই বঙ্গবন্ধু নিজেই ছয় দফার উল্লিখিত মূল সূত্রগুলো প্রণয়ন করনে। অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের ইতি টানতে স্বায়ত্বশাসনকে কেন্দ্রে রেখে তিনি সামনে আনেন ঐতিহাসিক কর্মসূচি যার দাবীগুলো সংক্ষেপে ছিলো - পাকিস্তান হবে একটি "ফেডারেশন" বা যুক্তরাষ্ট্র, কেন্দ্র কেবল দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করবেন, পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য আলাদা বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু, কর ও শুল্ক নির্ধারণে অঙ্গরাজ্যের স্বাধীনতা থাকবে, প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের আলাদা বৈদেশকি বাণিজ্যের হিসাব থাকবে পূর্ব বাংলার জন্য আলাদা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে ইত্যাদি।

বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে ছয় দফায় তিনি প্রতিফলন করেছিলেন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ভাবনা যা আলোড়ন তুলছিল মুক্তিকামী বাঙালির মনে গণতান্ত্রিকতার জন্য। যার ফলে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেই মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতা লাভের পরপরই ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতিশ্রুতিগুলি মাথায় রেখেই তিনি তৈরি করেছিলেন বাংলাদেশের সংবিধান।

বঙ্গবন্ধুর সংবিধান: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূলনীতি

স্বাধীনতা লাভের পর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ মুক্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে দিল্লীতে যাত্রাবিরতির সময়ই একজন সাংবাদিককে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- 'শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি'র বাংলাদেশ গড়তে চান। ১৯৭২ এর সংবিধান সোনার বাংলার পথে প্রথম সোপান। সংবিধানের প্রস্তাবনায় জনগণের -'অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধিতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে'।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী রাষ্ট্রচিন্তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছিলো সংবিধানের মূলনীতিতে, যেগুলো ছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এটা খুবই স্পষ্ট যে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কল্যাণমূখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি নিশ্চিত করেছিলো বঙ্গবন্ধুর সংবিধান। বঙ্গবন্ধুর নীতি অগ্রাধিকারের মধ্যে ছিলো- সামাজিক সচেতনতা বাড়িয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য সবুজ বিপ্লব।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮): পরিকল্পিত উন্নয়নের সুচিন্তিত পথনকশা

সুখী সমৃদ্ধ জাতি গঠনর উন্নয়ন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে মুক্তিযুদ্ধের সাহস ও উদ্দীপনার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সুচিন্তিত এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অভিযাত্রার সর্বপ্রথম বীজ বপিত হয়। মূল ভাবনায় ছিল- কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসন। প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫% উন্নিতকরণ। নিত্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ। বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা হ্রাস (৬২% থেকে ২৭%)। আমদানি নির্ভরতা কমাতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাড়ানো।

যুদ্ধোত্তর বাস্তবতার নিরিখে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারই ছিলো প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মূল কথা । কৃষি ও শিল্পকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দু'পায়েই এগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসনের তাগিদে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন পরিবহন, জ্বালানী, অবকাঠানো ও গৃহায়নকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সামাজিক খাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ রেখেছিলেন পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে বেগবান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে। প্রাথমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু ছিল সময় ও লক্ষ্যভিত্তিক সুনির্দিস্ট পরিকল্পনা। বাংলাদেশ নিয়ে আশাবাদী শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির অভিপ্রায় থেকে কুদরত-ই-কুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। মূলত: প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথনকশা।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আপোসহীন অভিযাত্রা

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি অপশাসনের কবল থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করাটাকে প্রথম বিপ্লব হিসেবে দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার তিন বছরের মাথায় বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সরকার পদ্ধতি, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, ভূমি, উৎপাদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচারব্যবস্থা, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদির মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এটিকেই বঙ্গবন্ধুর তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করেন যার প্রস্তাবনায় ছিল-দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা, বিকেন্দ্রায়িত সরকার, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, উন্নয়নে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং দেশব্যাপী সমবায় আন্দোলন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দুর্নীতি চিহ্নিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দুর্নীতিকে চিহ্নিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। দুনীতি দমন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির কেন্দ্রীয় জায়গায় ছিলো। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সঠিক পথেই এগুচ্ছিলো বাংলাদেশ। মাত্র চার বছরে মাথাপিছু আয় প্রায় তিন গুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল। তাঁকে শারীরিকভাবে হারিয়ে অর্থনীতি হারিয়েছিল সঠিক পথ । ১৯৭৫-এর পর্যায়ে ফিরতে সময় লেগেছিলো আরও ১৩ বছর।

আজও পথ দেখাচ্ছেন 'ভরসার বাতিঘর' বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অভিযাত্রা পরের দুই দশকে মন্থর হতে হতে প্রায় থেমে গিয়েছিলো। গত শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুতে উদারিকরণের ফলে অর্থনীতিতে কিছুটা গতি এলেও তা প্রত্যাশা ও আমাদের প্রকৃত সম্ভাবনার তুলনায় কমই বলতে হবে। তবে বঙ্গবন্ধু আমাদের মননে ও চিন্তায় সব সময়ই ছিলেন, আছেন। তাই বহু বাধা ডিঙিয়ে এগুনোর যে মানসিকতা তিনি এ জাতির মধ্যে তৈরি করেছিলেন তার কল্যাণেই আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। আর তার ফলে ১৯৯৬-এ দেশ আবার সঠিক পথে ফেরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে।

বঙ্গবন্ধু কন্যার হাত ধরে দেশ আবার এগুচ্ছে বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে

দেশের শাসনভার হাতে নিয়েই বঙ্গবন্ধুকন্যা তাঁর পিতার দেখানো পথে দেশকে এগিয়ে নিতে শুরু করেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের নতুন অভিযাত্রায় চলছেন বিরামহীন। তাঁরও একই উদ্দেশ্য ছিলো- দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয়া। বাস্তবানুগ বঙ্গবন্ধুকন্যাও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে দুঃখী মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের মূলমন্ত্র ধারণ করে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ বেছে নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর মতো তিনিও বহু দূর দেখতে পান। তাই তো তিনিও পঞ্চবার্ষিক, প্রেক্ষিত এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনার মতো সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করেছেন।

ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় আজ ২,৫৫৪ ডলার। দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ স্থাপন করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত, অর্থনীতিতে এসেছে ইতিবাচক কাঠামোগত পরিবর্তন। ফলে ক্রমহ্রাসমান দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য হার এবং জিডিপিতে প্রধান খাতগুলোর অবদান পরিবর্তন। দুই দশকে শিল্পের অবদান ১৮% থেকে বেড়ে ৩৫% হয়েছে। কৃষির ভাগ কমলেও উৎপাদন বেড়েছে। মহামারির কারণে দারিদ্র্য বিমোচন কিছুটা হোঁচট খেলেও জোরদার পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার কারণে অচিরেই আগের ধারায় ফেরা যাবে।

বিনিয়োগ বাড়ছে, ফলে বাড়ছে শিল্প ঋণ বিতরণও। বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাতে ইতবিাচক পরিবর্তন। বিতরণকৃত শিল্পে ঋণের ক্ষেত্রেও ঘটেছে উল্লম্ফন। বিগত দশকে বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত ২৬.৩ থেকে বেড়ে ৩১.৫৭ হয়েছে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৮-১৯-এ শিল্প ঋণ বিতরণ দশ গুণের বেশি বেড়ে হয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা।

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিফলিত হচ্ছে মানব উন্নয়ন সূচকগুলোতেও। দম্পতি-প্রতি সন্তান সংখ্যা কমে হয়েছে ২.১ (প্রায় আদর্শ অবস্থা)। ২০০৫ থেকে ২০১৬-তে গড় আয়ু ৬৫.২ বছর থেকে বেড়ে হয়েছে ৭২.৫ বছর (দক্ষিণ এশিয়ার গড় ৬৯ বছর)। একই সময়ের ব্যবধানে শিশু মৃত্যু হার প্রায় অর্ধেক কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ৩৫, মাতৃমৃত্যু প্রতিলাখে ৩৪৮ থেকে কমে হয়েছে ১৭০ (দক্ষিণ এশিয়ার গড় ২৩২)। মহামারির মধ্যেও ক্ষুধা সূচকের মান কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে (২০১২-এ ২৮.৬ থেকে ২০২১- এ ১৯.১)।

আরও বড় লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশঃ দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি, ক্ষুধামুক্ত দেশ, সম্পূর্ণ দারিদ্র্য বিমোচন, এসডিজি বাস্তবায়ন এবং উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা লক্ষ্যে অর্জনের গণবান্ধব শাসনের ধারাবাহিকতা এবং সুশাসন অপরিহার্য।

সমৃদ্ধ আগামীর পথনকশা

প্রধানত ভোগ-নির্ভর (৬৫%) প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা, জনসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিকস ইত্যাদি), মহামারি পরবর্তী বাস্তবতায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ উৎসাহিতকরণ, আইসিটি খাতে দেশের তরুণ জনশক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে দেশকে আরও যুক্ত করতে যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আরএমজি খাতে সমর্থন না কমিয়ে রপ্তানি বহমুখীকরণে জোর দিতে হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। এসএমই ও বিদেশি বিনিয়োগে জোর দিতে হবে। জলবায় পরিবর্তন সহনীয় উন্নয়ন (টেকসই নগরায়ন, সবুজ জ্বালানি ইত্যাদি) রাখতে হবে। কর-জিপিপি অনুপাত বাড়িয়ে (অন্তত ২০%) অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশের মার্নুষকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। আমাদের স্বাধীনতার এই ৫০ বছর পূর্তিতে আমাদের প্রত্যয়-জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলবো।

৬. প্যানেল আলোচকগণের বক্তব্যঃ

(ক) ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর বক্তব্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু এই দেশ আর দেশের মানুষ সম্পর্কে যতটুকু জানতেন, এর চেয়ে ভালোভাবে জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনি জীবনের গোড়া থেকেই এই দেশ আর মানুষের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁকে চিনতে জানতে এবং বুঝতে তাঁর ভাষণগুলো খুব কাজে লাগে। বঙ্গবন্ধুকে যদি উন্নয়ন দার্শনিক রূপে বুঝতে চাই তাহলে তাঁর ভাষণগুলো গুরুত্বপূর্ণ। ১০ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন "বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বসবাস করবে, খেয়ে পড়ে সুখে থাকবে, এই আমার জীবনের সাধনা"। বঙ্গবন্ধুর মুখনিসৃত এই একটি ছোট বাক্যে সমস্ত উন্নয়ন, সাধনা, দর্শন তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা বা রাষ্টভাবনা যাই বলি না কেন তিনি সবকিছুই স্পষ্ট করেছেন তাঁর ভাষণগুলোতে। বঙ্গবন্ধু সবকিছুকে সমন্বিত করে বলেছেন বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে যার তিনটি ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, নিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাকশাল প্রতিষ্ঠা। ৬ জুন ১৯৭৫ এ বাকশালের যে গঠনতন্ত্র তিনি প্রকাশ করেছেন সেটা অনুপুঙ্খভাবে যাচাই করলে আমরা বুঝতে পারতাম তার কিছু অংশও যদি বাস্তবায়িত হতো তাহলে আজকে বাংলাদেশে বিপ্লব হতো। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এ যাবত যা অর্জন করেছে তার সবই প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশে বৈষম্য আছে, আর বৈষম্য জিইয়ে রেখে কখনও উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রবৃদ্ধি হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। প্রবৃদ্ধির দিক থেকে আমরা সারা বিশ্বের নজর কাড়তে পারি। কিন্তু প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বা গড় আয়ু ইত্যাদি সূচক দিয়ে যুগলভিত্তিক অর্থনীতির চাল চিত্র বিচার করা যাবে না। আমাদের গড় মাথাপিছু আয় ২৫৫৪ ডলার। বিদ্যমান পুঁজিবাদী পদ্ধতির উপর দাঁড়িয়ে আছে এই মাথাপিছু আয়ের হিসাব। এটা দিয়ে সমাজে বৈষম্য দূর করা যাবেনা। প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে এক করে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ এ মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে মুক্তিযুদ্ধের ০৩টি লক্ষ্যের কথা ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই ৫০ বছরে বাংলাদেশ এই তিনটি লক্ষ্যের একটিও অর্জন করতে পেরেছে কিনা। বঙ্গবন্ধুর এই অর্জনের পথ তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সংবিধানে। পৃথিবীর কোন দেশের সংবিধানে বলা হয়নি যে, জনগণ রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আমাদের অর্থনীতি এবং রাজনীতির মধ্যে যে বৈপরিত্য তা নিরসন করতে হবে অনতিবিলম্বে। তা না হলে অর্থনীতির এই অগ্রগতি হুমকির মুখে পড়বে। আমরা এগুচ্ছি অবশ্যই, যেতে হবে আরও বহুদুর। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে সামনে রেখে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।

(খ) ড. বিনায়ক সেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের ৫০ বছরের দিকে তাকালে প্রথম যে বিষয়টি নজর কাড়ে তা হচ্ছে ধারণাতীত উন্নয়ন। যেমন- গার্মেন্টস শিল্পের কথা ধরা যায়। সত্তরের দশকেও কোন অর্থনীতিবিদ ধারণা করতে পারেননি বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্প একটি বড় শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। এমনকি নব্বইয়ের দশকেও এই শিল্প এত ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করবে তা বোঝা যায়নি। যেমনটি বুঝা যায়নি যখন বঙ্গবন্ধু যখন বলেছিলেন, আমাদের ০৩টি বিষয়ের উপর জোড় দিতে হবে- উৎপাদন বাড়ানো, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ। তখনও বুঝা যায়নি এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা সক্ষম হতে পরবো কিনা। আমাদের মাথাপিছু আয় একসময় ঋণাত্মক হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৮ সালে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল শূন্যের কাছাকাছি, যা বর্তমানে ২৫৫৪ ডলার। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেশের মোট জন্মদানের হার ছিল ৬ শতাংশ, যা

বর্তমানে প্রায় ২.১ এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। যেটা আগে কখনও ভাবা যায়নি। তেমনি কৃষি, নারী শিক্ষা, শিল্প উন্নয়নসহ কোনও ক্ষেত্রেই এদেশের উন্নয়নকে আগে থেকে ধারনা করা যায়নি। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন যে, রাজনৈতিক উদারনীতির সাথে অর্থনৈতিক সমতার একটি যোগসূত্র রয়েছে। তিনি এদেশে একধরণের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এদেশের মধ্যবিত্ত বিশেষ করে কৃষকভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের ক্ষেত্রে। এরপর যখন বঙ্গবন্ধু নয়াচীনে গমন করলেন তখন থেকেই তাঁর মনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার চিন্তা যুক্ত হয়। অত:পর ১৯৬৪ সালে যখন আওয়ামীলীগ পুনরুজ্জীবিত হল এবং বঙ্গবন্ধু হাল ধরলেন, তখন প্রথমবারের মত শোষণমুক্ত সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা উল্লেখ করা হলো। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

৭. **উন্মুক্ত আলোচনা:** পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী উন্মুক্ত আলোচনা সঞ্চালন করেন ।

(ক) ড. হোসনে আরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, টিএমএসএস বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য দূর করতে হবে। সোনার বাংলা গড়তে হলে দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। অধিক শিল্প বিকাশ হলে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কৃষিকেও অগ্রাধিকার দিয়ে বিকল্প চালের মত প্রধান খাদ্যের বিকল্প আলু জাতীয় শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করলে চাল আমদানি করার প্রয়োজন থাকতো না।

(খ) ড. গাজী মো: সাইফুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও এদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর বঙ্গবন্ধুর যে প্রত্যয় তা এবং বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা একই সুতোয় গাঁথা। আমাদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কি কি চ্যালেঞ্জ আছে বা প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো সনাক্ত করে তা থেকে উত্তরণের পথ বের করা প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষা কাঠামোকে জীবনমুখী বিষয় আরও বেশি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার যাতে ছাত্ররা যখন কর্মে আসবে তারা তাদের জীবনমুখী শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারে। এটি দেশে দক্ষ জনবল তৈরিতেও সফল হবে। তিনি বলেন, স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য আমাদের উন্নয়নের সকল স্তরেই প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় নির্ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

(গ) অধ্যাপক ড. মো: আবুল হোসেন, সমাজকর্ম বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি দমনের বিষয়ে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

(ঘ) অধ্যাপক ড. মো: ছিদ্দিকুর রহমান, পরিসংখ্যান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, কাগুজে টাকাকে ইলেকট্রনিক টাকায় পরিণত করা প্রয়োজন। ইলেকট্রনিক টাকা আদান প্রদানের মাধ্যমে একজনের টাকা আরেকজনের কাছে অন্যায়ভাবে যেতে পারে না। জনগণের আয় থেকে করও সরকার কেটে নিতে পারবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমেই।

(ঙ) জনাব তপন কুমার নাথ, প্রতিনিধি, টিএমএসএস বলেন, পশ্চাৎপদ বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সেক্টর ওয়াইজ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

(চ) জনাব খলিল আহমেদ, মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বলেন, মাইক্রো-ক্রেডিট থেকে সরে আসতে হবে। মাইক্রো-ক্রেডিট দিয়ে কাঙ্খিত উন্নয়ন হবে না। উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থান প্রয়োজন। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তুলতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশে স্থায়ী উন্নয়ন হবে। সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে।

(জ) ড. অঞ্জন কুমার দেব রায়, যুগ্মপ্রধান, কৃষি পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ বলেন, বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ, তাঁর আদর্শকে ধারণ করতে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরেই তা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৮. সমাপনী বক্তব্য

জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, সচিব,পরিকল্পনা বিভাগ

সভাপতি মহোদয় প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মূল উপস্থাপক এবং বিজ্ঞ প্যানেল আলোচকগণসহ উপস্থিত সকলকে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আজকের আলোচনায় উঠে আসা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেম, জীবনাদর্শ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার উন্নয়ন ভাবনা উপস্থিত সকলকে প্রশিক্ষিত করেছে। অর্জিত বিষয়গুলো স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়ে একই আদর্শে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এখন সকলের দায়িত্ব।

২৪/১২/২০২১
ফরিদা সুলতানা
উপসচিব
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

২৪/১২/২০২১
রাহ্‌নুমা নাহিদ
উপপ্রধান
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন